রবীন্দ্র চিন্তাধারায় মহাকবি হাফিযের প্রভাব: একটি পর্যালোচনা

মুহাম্মদ শাহজালাল*

বাংলা সাহিত্যে নোবেল বিজয়ী কবি হলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর নোবেল বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্য বিশ্ব সাহিত্যাঙ্গনে লাভ করেছে বিশেষ পরিচিতি। সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অনন্য অবদান রেখে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন তিনি। গড়ে তুলেছেন গল্প, কবিতা ও সংগীতের বিশাল রচনাসম্ভার। এ রচনাসম্ভার তৈরীর পাশা-পাশি পারস্যের যুগশ্রেষ্ঠ কবিদের কাব্যের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ফারসি সাহিত্যের প্রভাব। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে পারস্যের সূফি কবিদের কাব্য বিশেষ করে ফেরদৌসীর *শাহ্নমেহ্*, জালালুদ্দিন রুমির *মাসনাভীয়ে মা-নাভী* ও মহাকবি হাফিযের *দীওয়ানে হাফিয* পাঠ করা হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ফারসি ভাষা জানতেন। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাকবি হাফিযের *দীওয়ানে হাফিয* মুখস্থ ছিল। এজন্য শৈশবকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হাফিযের কাব্য সাহিত্যের সাথে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। জীবনের শেষ বয়সে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পারস্য ভ্রমণ করেছিলেন। পারস্যের মহাকবি হাফিযের সমাধিকে পিতার তীর্থস্থান বলে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছেন তিনি। রবীন্দ্র চিন্তাধারার বহুবিধ দিক রয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে রবীন্দ্র চিন্তাধারায় মহাকবি হাফিযের প্রভাব আলোকপাত করতে চেষ্টা করবো।

মহাকবি হাফিয হলেন বিশ্বসাহিত্য জগতে এক মহান প্রতিভা। ড. আহ্মাদ তামীমদারী তাঁর পরিচিতি তুলে ধরে বলেন–

> হাফেযের আসল নাম খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ হাফেয শিরাযী। পিতার নাম বাহাউদ্দীন। তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন ইসফাহানের অধিবাসী। তাঁর মা ছিলেন কাযেরুন বংশোদ্ভূত। পরবর্তীতে ইরানের শিরাযেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তারা। হাফেযের জন্ম হয় ৭২৭ (১৩২৬ খ্রি.) হিজরীতে। তাঁর জন্মস্থান শিরায নগরী। তিনি ছিলেন বাহাউদ্দীনের সর্বকনিষ্ঠ ছেলে।[১]

* অধ্যাপক ও পরিচালক, মডার্ন ল্যাংগুয়েজ সেন্টার, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়, খুলনা।

শৈশবে পিতার মৃত্যু হলে মাতার নিকট লালিত পালিত হন। হাফিয ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন। বাল্যকালেই তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করে 'হাফিয' খ্যাতি অর্জন করেন। তাই তিনি 'হাফিয' হিসেবেই বিশ্বে পরিচিত। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের নাম *'দীওয়ানে হাফিয'*। তাঁর অনেক গযলে তিনি এ নামটিই ব্যবহার করেছেন।

খুলনা জেলার ফুলতলা থানার দক্ষিণ ডিহি নামক স্থানের সারদা সুন্দরীর গর্ভে ২৫ বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দে ৭ই মে ১৮৬১ সালে কলকাতার বিখ্যাত জোড়া সাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।[২] কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা পারস্যের মহাকবি খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিযের ভক্ত ছিলেন। তাই তিনি স্বীয় পুত্রের নাম রাখলেন মহাকবি খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ হাফিযের নামের সাথে মিল রেখে রবীন্দ্রনাথ। আরবি শামস্ শব্দের অর্থ সূর্য বা রবি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাকবি হাফিযের কবিতারও অনুরক্ত বা ভক্ত ছিলেন। তাঁর হাফিযের সমগ্র কাব্য মুখস্থ ছিল এ জন্য তাঁকে হাফিযে হাফিয বলা হত। প্রফেসর ড: মুহাম্মদ আবদুল্লাহ *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য* গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, "কবি হাফেযের অজস্র শে'র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭-১৯০৫) কণ্ঠস্থ ছিল। তাই তাঁকে 'হাফেয-এ-হাফেয' বলা হত।"[৩]

প্রফেসর ড. এম শমসের আলী বলেন-

> মাত্র দুইশত বছর আগেও ফারসি ছিল এ উপমহাদেশের শিক্ষিতজনের ভাষা ও দাপ্তরিক ভাষা। আমাদের ভাষা ও সাহিত্যে ফারসির ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। কথিত আছে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বাবা কবি হাফিযের পুরো দিওয়ান কণ্ঠস্থ করেছিলেন এবং কবি যখন মাতৃগর্ভে তখন তার পিতা নিয়মিত হাফিযের কবিতা পাঠের ব্যবস্থা করেছিলেন যেন সেই আবহে গর্ভস্থ সন্তান একজন কবি হয়ে জন্মান।[৪]

কাজী আবদুল ওদুদ-এর ভাষায়–"রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর বহুগুণে ভূষিত ছিলেন। মার্তৃভাষা ভিন্ন পার্সী, আরবী, ইংরেজী ও সংস্কৃত জানতেন।"[৫] "তাঁর সুযোগ্য সন্তান মরমীয়া সাধনার প্রতি আসক্ত ছিলেন। যুক্তিবাদ এই পরিবারের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল। দেবেন্দ্রনাথ চন্দ্রালোকিত রজনীতে হাফিজের গযল পাঠে রসোন্মতায় নৃত্যে বিভোর হইতেন। তিনি হিমালয়ের বক্ষে নির্জন সাধন পন্থা অবলম্বন করতেন।"[৬] পারিবারিক ঐতিহ্যেই হোক বা জ্ঞান অন্বেষণের জন্যই হোক ফারসির প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম ভালোবাসা ছিল তা তাঁর নিম্নোক্ত উক্তি থেকেই প্রতীয়মান হয়। এ প্রসংঙ্গে তিনি বলেন-"একদিন দূর থেকে পারস্যের পরিচয় আমার কাছে পৌঁছেছিল। তখন আমি বালক। সে পারস্যের ভাবরসের পারস্য, তার ভাষা যদিও পারসিক, তার বাণী সকল মানুষের।"[৭] কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পারস্য সফর করেছিলেন পারস্য রাজার নিমন্ত্রণে।

১৯৩২ সালের ১১ এপ্রিল সত্তর বছর বয়সে কবির দেশ ফুলের দেশ বের হয়ে পড়লেন পারস্য পানে। ১৭ এপ্রিল কবি ইরানের মহাকবি হাফিয ও শেখ সা'দীর জন্মভূমি শিরাজ নগরে এসে উপস্থিত হন।

শিরাজের গভর্নরের সাথে আলাপচারিতায় কবি বললেন–

> যথোচিতভাবে আপনাদের সৌজন্যের প্রতিযোগিতা করি এমন সম্ভাবনা নেই। কারণ, আপনারা যে ভাষায় আমাকে সম্ভাষণ করলেন সে আপনাদের নিজের, আমার এই ভাষা ধার করা। জমার খাতায় আমার তরফে একটিমাত্র অংক উঠল, সে হচ্ছে এই যে, আমি সশরীরে এখানে উপস্থিত। বঙ্গাধিপতি একদা কবি হাফেজকে বাংলায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন, তিনি যেতে পারেননি। বাংলার কবি পারস্যাধিপতির নিমন্ত্রণ পেলে, সে নিমন্ত্রণ রক্ষাও করলে এবং পারস্যকে তার প্রীতি ও শুভকামনা প্রত্যক্ষ জানিয়ে কৃতার্থ হল।[৮]

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বঙ্গাধিপতির কথা বলেছেন তিনি হলেন বাংলার স্বাধীন সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ্।[৯] মহাকবি হাফিযকে ভালবেসে বাংলায় আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। কবি আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে পারস্য সাগরের কিনার পর্যন্ত উপনীত হয়েছিলেন। কিন্তু পারস্য সাগরের উত্তাল তরঙ্গ দেখে কবির অন্তর কেঁপে ওঠে এবং শারিরিক অসুস্থতার কারণে বাংলায় আসতে পারেননি তিনি। অপারগতায় সুলতানকে অমরবাণী উপঢৌকন হিসেবে পাঠালেন নিম্নোক্ত গযলটি–

ساقی حدیث سر و گل و لاله می رود
সাকী ! হাদিসে সারভো গুলো লা'লেহ্ মীরাভাদ
وین بحث با ثلاثه غساله می رود
ভীন বাহাস বা' সালা'সেহ গাসসা'লেহ্ মীরাভাদ
شکرشکن شوند همه طوطیان هند
শেকার শেকান শাভান্দ হামেহ তোতীইয়া'নে হিন্দ
زین قند پارسی که به بنگال می رود
জীন ক্বান্দে পা'রসি কে বেবাঙ্গা'লে মীরাভাদ
طی مکان ببین وزمان در سلوک شعر
তেই মাকা'ন বেবীনো যামা'ন দার সুলোকে শে'র
کاین طفل یکشب ره یکساله میرود
কীন তিফলে ইয়াকশাবে রা'হে ইয়াকসা'লে মীরাভাদ

آن چشم جادوانه عابد فریب بین
অ'ন চেশমে জা'দুভা'নে আ'বেদে ফারীব বেবীন
کش کاروان سحر ز دنباله میرود
কেশ কা'রেভা'নে সেহের যে দুম্বা'লেহ্ মীরাভাদ
از ره مرو وبعشوه دنیا که این عجوز
আয রাহে মারো বেউশভায়ে দুনইয়া' কে ইন আজোয
مکاره می نشیند و محتاله میرود
মাক্কা'রেহ্ মী নেশীনান্দো মুহ্তা'লেহ্ মীরাভাদ
باد بهار می وزد از گلستان شاه
বা'দে বাহা'র মী ভাযাদ আয গুলিস্তা'নে শা'হ্
وز ژاله باده در قدح لاله میرود
ভায য্বা'লেহ্ বা'দেহ্ দার ক্বাদহে লা'লেহ্ মীরাভাদ
حافظ زشوق مجلس سلطان غیاث دین
হা'ফিয যে শোওক্বে মাজলিসে সুলতা'ন গিয়া'সে দীন
غافل مشو که کار تو از ناله می رود
গা'ফেল মাশো কে কা'রে তো আয ন'লেহ্ মীরাভাদ[১০]
'হে সাকী! দেবদারু, ফুল ও টিউলিপের আলোচনা চলছে
পান-পিয়লাসহ তিন প্রেয়সীকে[১১] নিয়ে আলোচনা চলছে।
আজকে পাঠাই বাংলায় যে ইরানের এই ইক্ষু শাখা
এতেই হবে ভারতের সব তোতার চক্ষু মিষ্টি মাখা।[১২]
কবিতার রীতিতে স্থান ও সময়ের অতিক্রম দেখো
এক রাতের এই শিশুকে এক বছরের পথঅতিক্রম করছে।
[এক রাতে বসে লেখা কবিতা প্রচারের ক্ষেত্রে এক বছরের রাস্তা অতিক্রম করছে]
তাপসের মন ভোলানো যাদুময় ঐ চক্ষু দেখ,
তার পেছনে যাদুর কাফেলা ছুটে চলেছে।
পথ ভুলে যেয়োনা দুনিয়ার মোহে, এ যে প্রতারক বুড়ি

সর্বক্ষণ তোমার জন্যে প্রতারণার ফাঁদ পেতে রেখেছে।
বাদশাহ গিয়াসুদ্দীনের বাগান হতে বসন্ত-মলয় প্রবাহিত হচ্ছে
লালা ফুলের পানপাত্রে শিশিরের মদিরা জমা হচ্ছে।
হে হাফেজ! সুলতান গিয়াস উদ্দীনের মজলিশের উদ্দীপনা নিয়ে
চুপ থেকো না
কারণ ক্রন্দন দিয়েই তোমার কার্য সফল হবে ।[১৩]

১৭ এপ্রিল কবি পারস্যের মহাকবি শেখ সা'দীর সমাধিতে যান। সমাধি প্রাঙ্গনে অভ্যর্থণা সভায় কবি বলেন –

> আপনাদের পূর্বতন সূফীসাধক কবি ও রূপকার যাঁরা আমি তাঁদেরই আপন, এসেছি আধুনিক কালের ভাষায়ে; নিয়ে তাই আমাকে স্বীকার করা আপনাদের পক্ষে কঠিন হবে না। কিন্তু নতুন কালের যা দান তাকেও আমি অবজ্ঞা করি নে।[১৪]

এরপর তিনি মহাকবি হাফিযের সমাধিতে এসে বললেন–

> হাফেজের সমাধি দেখতে বেরলুম, পিতার তীর্থ স্থানে আমার মানস-অর্ঘ নিবেদন করতে। আমার পিতা ছিলেন হাফেজের অনুরাগী ভক্ত। তাঁর মুখ থেকে হাফিযের কবিতার আবৃত্তি ও তার অনুবাদ অনেক শুনেছি। সেই কবিতার মাধুর্য দিয়ে পারস্যের হৃদয় আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল।[১৫]

পারস্য সফরকালে তিনি পারস্য রাজার সাথে সাক্ষাৎ উপলক্ষে উপহারস্বরূপ নিজের কতগুলো বই রেশমের আবরণে প্রস্তুত করে সেই সঙ্গে নিজের রচিত একটি কবিতা উপহার দিলেন–

"আমার হৃদয়ে অতীতস্মৃতির
সোনার প্রদীপ এ যে
মরিচা- ধরানো কালের পরশ
বাঁচায়ে রেখেছি মেজে।
তোমরা জ্বেলেছ, নতুন কালের
উদার প্রাণের আলো–
এসেছি, হে ভাই, আমার প্রদীপে
তোমার শিখাটি জ্বালো।

I carry in my heart golden lamp of remembrance of an illumination that is past.
I keep it bright against the tarnishing touch of time.
Thine is a fire of new magnanimous life.
Allow it, my brother, to kiss my lamp with its flame.[১৬]

পারস্যের রাজা ও আমন্ত্রিত কবিদের উদ্দেশ্যে কবিগুরু বললেন–

> আমি তাঁদের উদ্দেশে আমার সকৃতজ্ঞ অভিবাদন অর্পণ করতে চাই যাঁদের কাব্যসুধা জীবন্তকাল পর্যন্ত আমার পিতাকে এত সান্ত্বনা এত আনন্দ দিয়েছে। কবির আপন ভাষায় যদি দিতে পারতুম তবেই আমার যোগ্য হত। যে ভাষা অগত্যা ব্যবহার করছি আমার ভারতী সে ভাষায় সম্পূর্ণ সায় দেয় না। তাই আমি এখানে যেন ম্যুজিয়মে-সাজানো পাখি–তরজমার আড়ষ্টতায় আমার পাখা বদ্ধ–সে পাখা বিস্তার করে মন উড়তে পারে না, সে পাখায় সজীব প্রাণের বর্ণচ্ছটাময় নৃত্য নেই। তা হোক, মৌনের মধ্যে যে বাণী অনুচ্চারিত, বন্দনায় তারও ব্যবহার হয়ে থাকে। সেই আন্তরিক বাণীর দ্বারাই পারস্যের অমর কবিদের আমি আজ অভিবাদন করি; সেই সঙ্গে পারস্যের অমর আত্মাকেও আমার নমষ্কার, যে আত্মা ইতিহাসের উত্থানপতনের মধ্যে দিয়ে বিচিত্র সৌন্দর্যে শৌর্যে কল্যাণে ভাবীকালের দূরদিগন্তব্যাপী ক্ষেত্রে নিজেকে গৌরবান্বিত করবে।[১৭]

৬ মে কবির জন্মদিন। বিদেশের মাটিতে এই প্রথম জন্মদিন পালিত হয়। কবিগুরু পারস্যে তাঁর জন্মদিনের আনন্দ ব্যক্ত করে বলেন–

> আমার পারসিক বন্ধুরা এই দিনের উপর সকালবেলা থেকে পুষ্পবৃষ্টি করছেন। আমার চারি দিক ভরে গেছে নানাবর্ণের বসন্তের ফুলে, বিশেষত গোলাপে। উপহারও আসছে নানা রকমের। এখানকার গবর্মেন্ট থেকে একটি পদক ও সেইসঙ্গে একটি ফর্মান পেয়েছি। বন্ধুদের বললুম– আমি প্রথমে জন্মেছি নিজের দেশে, সেদিন কেবল আত্মীয়েরা আমাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। তার পরে তোমরা যেদিন আমাকে স্বীকার করে নিলে আমার সেদিনকার জন্ম সর্বদেশের– আমি দ্বিজ।[১৮]

পারস্যে জন্ম দিন উপলক্ষে কবিদের উদ্দেশ্যে কবির রচিত কবিতা–

ইরান, তোমার যত বুলবুল,
তোমার কাননে যত আছে ফুল
বিদেশী কবির জন্মদিনেরে মানি

শুনালে তাহারে অভিনন্দনবাণী।
ইরান, তোমার বীর সন্তান
প্রণয়-অর্ঘ্য করিয়াছে দান
আজি এ বিদেশী কবির জন্মদিনে.
আপনার বলি নিয়েছে তাহারে চিনে।
ইরান, তোমার সম্মান মানে
নবগৌরব বহি নিজ ভালে
সার্থক হল কবির জন্ম দিন।
চিরকাল তারি স্বীকার করিয়া ঋণ
তোমার ললাটে পরানু এ মোর শ্লোক–
ইরানের জয় হোক।

Iran, all these roses in thy garden
and all their lover birds
have acclaimed the birthday
of the poet of a far away shore
and mingled their voices in a paean of rejoicing.
Iran, thy brave sons have brought
their priceless gifts of friendship
on this birthday of the poet of a far away shore,
for they have known him in their hearts as their own.
Iran, crowned with a new glory
by the honour from thy hand
this birthday of the poet of a far away shore
finds its fulfilmen.
And in return I bind this wreath of my verse
on the forehead, and cry; victory of Iran! [১৯]

ঐতিহাসিক সূত্র থেকে জানা যায় যে, ইরানের আদি অধিবাসীরা ছিল আর্য বংশোদ্ভূত। "ইরানী ও ভারতীয় একই আর্যগোষ্ঠীর দুই শাখা। দুই জাতির ইতিহাসেই অনেকখানি মিল দেখতে পাওয়া যায়।"[২০] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারততীর্থ কবিতায় আর্য-অনার্য ও ইংরেজদের আহবান জানিয়ে বলেন–

"এসো হে আর্য, এসো অনার্য
হিন্দু মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ
এসো এসো খ্রীস্টান।
মার অভিষেক এসো এসো ত্বরা
মঙ্গল ঘট হয়নি যে ভরা
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"[২১]

"সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরের কথা বলেছেন। তাতে হিন্দু-মুসলমানের কল্পনাতো আছেই অধিকন্তু আছে সার্বভৌম জাতি ধর্ম বর্ণের মহামিলনের কল্পনা।"[২২] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে পারিবারিকভাবেই পারস্যের মরমীবাদ চর্চা হতো। তাঁর পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে বলেছেন: বৈষ্ণব ধর্মমত ও পদাবলী তাঁর হৃদয়কে অধিকার করে নাই এবং তাঁর পিতা সম্পর্কে বলেন–"আমি জানি যে, হাফেজের ধর্মীয় দর্শন ও কবিতা আমার পিতার হৃদয়কে যতখানি অভিভূত করত, বৈষ্ণব দর্শন ও সঙ্গীত ততখানি করতে পারত না। হাফেজ ছিলেন তাঁর ঐশ্বরিক আনন্দ। তিনি নিজে কবিতা লিখতেন না। হাফেজের কবিতাই তার সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতো। উপনিষদ তাঁর ক্ষুধা নিবৃত করত এবং হাফেজ তাঁর তৃষ্ণা মিটাইতো।"[২৩] পিতার উপযুক্ত পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেন পিতার উত্তরাধিকার সূত্রে পারস্যের মরমীবাদ তাঁর কবিতায় প্রকাশ করেছিলেন। "মানুষের মরমি চিন্তা আজন্মকালের। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি শিশুতোষ কবিতায় বলেন:

খোকা মাকে সুধায় ডেকে
এলাম আমি কোথা থেকে
কোনখানে তুই কুড়িয়ে পেলি আমাকে?

জীবন প্রভাতে খোকার মনে উদিত এ প্রশ্ন আমাদেরও। আমি কোথা থেকে কিভাবে এলাম, আর ফিরেই বা যাব কোথায়? মানুষের মনের এ প্রশ্নই বিশ্বব্যাপী মরমী চিন্তার প্রকাশ।"[২৪] পারস্যের মহাকবি হাফিয হলেন 'অদৃশ্য জগতের কণ্ঠস্বর' কারণ–

> হাফিজের কবিতায় এমন সব প্রতীক ও ব্যাখ্যা আশ্রয় লাভ করেছে যে, একশ্রেণীর মুসলমানরা তাকে 'রহস্যময় ভাষা' বলে অভিহিত করেন। তাই হাফিজ বর্ণিত প্রেমকে তাঁরা জৈব-ক্ষুধার নিবৃত্তি বলে চিহ্নিত করতেও ভুল করেননি। ফলে হাফিজের মৃত্যুর পর তাঁর জানাযা নিয়ে প্রশ্ন উঠে এবং ধর্মপ্রাণ শরীয়তপন্থী মুসলমানরা জানাযায় অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে এবং বিনা জানাযায় দাফন করার পক্ষে রায় দেয়। কিন্তু তাঁর অগণিত ভক্ত এবং আত্মীয়-স্বজনরা এক সুন্দর উপায়ে এই বির্তকের সমাধান করেন। তাঁরা টুকরো টুকরো কাগজে হাফিজের গযল লিখে একটি পাত্রে সংস্থাপন করে একজন মাসুম শিশুকে তার মধ্য থেকে একটি উঠিয়ে আনতে নির্দেশ দেন। বলা ছিল, যে ধরনের গযল উঠে আসবে সেই গযলের অর্থ অনুসারেই তাঁর দাফু কার্য সমাধান হবে। এতে ইমাম রাযী হলেন। সেই মাসুম অর্থাৎ নিষ্পাপ শিশু পাত্র থেকে এক টুকরো কাগজ তুলে নিতেই তার মধ্যে উঠে এলোঃ"[২৫]

قدم دريغ مدار از جنازهٔ حافظ
কাদাম দারীগ মুদা'র আয জানা'যেয়ে হা'ফিয[২৬]
كه گرچه غرق گناه است میرود بهشت
গারচে গারকে গুনা'হ্ আস্ত মীরাভাদ বেহেশ্ত।
ফিরে যেওনা হাফিযের জানাযা হতে
সহস্র পাপে ডুবে থাকলেও সে, যাবে বেহেশ্তে।

ফারসি সাহিত্যের গবেষকগণ মহাকবি হাফিযের *দীওয়ানে হাফিয* সম্পর্কে বলেন–

> হাফেযের *দীওয়নে* হলো *'নেযামেরেন্দী'* তথা দরবেশী বা সূক্ষ্মদর্শী আরেফের জীবন পদ্ধতি। একজন *রেন্দী* (বাকচাতুর্যে পটু এমন তাপস ব্যক্তি বা সূক্ষ্মদর্শী আরেফ) চিন্তা ও কর্মে প্রেম বা এশকের ওপর নির্ভর করে থাকেন। এমনিভাবে *এশক্* বা প্রেম প্রায়শই তাঁর *দীওয়ানে* ব্যবহৃত হয়েছে এবং তা প্রায় ২৩৪ বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। যেহেতু রেন্দীর সাথে এশকের একটা সম্পর্ক বা সাযুজ্য রয়েছে, সাধারণত সে কারণেই এ শব্দ দুটো একত্রে ব্যবহৃত হয়। এ পদ্ধতিকে জানার একমাত্র উপাদানই হলো প্রেম। অতএব প্রেম হলো প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কিত মতবাদের শিক্ষক বা দিকনির্দেশক। যে ব্যক্তি এশ্ক ও রেন্দী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হন, তিনি ভেদ বা গূঢ় রহস্যগুলো সম্পর্কেও অবগত হন। অবশ্যই হাফেযের দৃষ্টিতে একজন রেন্দ কতগুলো গুণ বা বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছেন।[২৭]

কবিগুরুর ইরান সফর কোন সাধারণ সফর ছিল না। এ সফর ছিল কবির জীবনের এক মহাক্লান্তিকাল। যখন তিনি ইরান সফর করেন তখন ভারত ছিল ব্রিটিশের আধিপত্যের বেষ্টনীতে আবদ্ধ। ভারত স্বাধীন হবে কি হবে না সে তথ্য জানার একমাত্র উপায় ছিল মহাকবি হাফিযের আধ্যাত্মিক দর্শন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাকবি হাফিযের কবরের পাশে উপস্থিত হয়ে তিনিও দিওয়ানে হাফেজ থেকে 'ফাল' গ্রহণ করেন। ফাল গ্রহণকে বাংলায় বলতে হবে 'ভাগ্য গণণা'। ভারত স্বাধীন হবে কি হবেনা, সে তথ্য জানতে চেয়ে ছিলেন দিওয়ানে হাফেজের মাধ্যমে। জবাবে হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। দিওয়ানে হাফিয খোলার পরই কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সামনে দিওয়ানের এ দু'টি চরণ ভেসে ওঠে।[২৮] হাফিয বলেন–

يوسف گم گشته باز آيد بكنعان غم مخور
ইউসূফ গুম গাশতে বা'য অ'ইয়াদ বে কেনআ'ন গাম মাখোর
كلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
কুলবেয়ে আহযা'ন শাভাদ রোযী গুলিস্তা'ন গাম মাখোর[২৯]
দুঃখ করো না হারানো য়ুসুফ
কানানে আবার আসবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ-মরু পুনঃ
হয়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে।"[৩০]

সত্যিই ব্রিটিশের হাত থেকে ফিরে এসেছে ভারত। রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও কোন শুভ কাজের পূর্বে *দীওয়ানে হাফিয* থেকে 'ফাল' গ্রহণ করতেন। তাঁর বন্ধু রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)[৩১] ১৮০৩ সালে *'তুহফাৎ-উল-মুয়াহ-হিদীন* (একেশ্বর-বিশ্বাসীদের উপহার) নামে ফারসি ভাষায় একটি পুস্তিকা রচনা করেন। উক্ত পুস্তিকার পরিসমাপ্তি টানেন পারস্যের মহাকবি হাফিযের নিম্নোক্ত গযল রচনার মাধ্যমে। হাফিয বলেন–

چندين فنون شيخ نيرزد به نيم خس
চান্দীন ফুনোন শায়খে নীর যাদ বে নীম খাস
راحت بدل رسان كه همين مشرب است وبس
রা'হাত বেদিল রেসা'ন কে হামীন মুশাররাব আস্তোবাস্[৩২]
مباش در پی أزار وهرچه خواهی كن
মুবা'শ দার পেয়ে অ'যারো হারচে খাহী কুন[৩৩]

که در طریقت ما غیر ازین گناهی نیست
کে দার তারীক্বাতে মা' আযীন গুনাহী নীস্ত।
"শায়েখ-এর এত ভণ্ডামিপূর্ণ কাজের এক ছিদাম মূল্য নেই;
মানবের অন্তরে তৃপ্তি দাও, পারমার্থিক উপদেশ।
কোনো জীবের অনিষ্ট করো না, এছাড়া যা খুশি তা করতে পার,
কারণ অন্যের অনিষ্ট করা ছাড়া আর কোনো পাপ আমাদের পথে নেই।"[৩৪]

মহাকবি হাফিয শিরাযি ৭৯২ বা ৭৯৩ হিজরি মোতাবেক ১৩৮৯ বা ১৩৯০ খ্রি. ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জন্মভূমি শিরাযেই দাফন করা হয়। পারস্যবাসী তাঁর সমাধির নাম দিয়েছেন 'হাফিযিয়া'। এ হাফিযিয়া সম্পর্কে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'শাখ্-ই-নবাত'[৩৫] কবিতায় বলেন–

ঘুমায় হাফিজ "হাফিজিয়া"য়, ঘুমাও তুমি নহর-পারে,
দীওয়ানার সে দীওয়ান-গীত এক্‌লা জাগে কবর-ধারে।
তেম্‌নি আজো আঙুর ক্ষেতে গেয়ে বেড়ায় বুলবুলিরা,
তূতীর ঠোঁটে মিষ্টি ঠেকে তেম্‌নি আজো চিনির সিরা।
তেম্‌নি আজো জাগে সাকি পাত্র হাতে পানশালাতে–
তেম্‌নি করে সুর্মা-লেখা লেখে ডাগর নয়ন-পাতে।
তেম্‌নি যখন গুল্‌যার হয় শারাব-খানা, "মুশায়েরা",
মনে পড়ে রোক্‌নাবাদের কুটির তোমার পাহাড়–ঘেরা।
গোধূলি সে লগ্ন আসে, সন্ধ্যা আসে ডালিম ফুলী,
ইরান মুলুক বিরান ঠেকে, নাই সেই গান, সেই বুলবুলি।
হাফেজিয়ায় কাঁদন ওঠে আজো যেন সন্ধ্যা প্রভাত–
"আমার গোপন প্রিয়া কোথায় কোথায় শাখ্-ই-নবাত।[৩৬]

হাফিযের সমাধির পাশে বসে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন –

> এই সমাধির পাশে বসে আমার মনের মধ্যে একটা চমক এসে পৌছল, এখানকার এই বসন্তপ্রভাতে সূর্যের আলোতে দূরকালের বসন্তদিন থেকে কবির হাস্যোজ্জ্বল চোখের সংকেত। মনে হল আমরা দুজনে একই পানশালার বন্ধু, অনেকবার নানা রসের অনেক পেয়ালা ভরতি করছি। আমিও তো কতবার দেখেছি আচারনিষ্ঠ ধার্মিকের কুটিল ভ্রুকুটি। তাদের বচনজালে আমাকে বাঁধতে পারেনি; আমি পলাতক,

> ছুটি নিয়েছি অবাধপ্রবাহিত আনন্দের হাওয়ায়। নিশ্চিত মনে হল আজ, কত-শত বৎসর পরে জীবনমৃত্যুর ব্যবধান পেরিয়ে এই কবরের পাশে এমন একজন মুসাফির এসেছে যে মানুষ হাফেজের চিরকালের জানা লোক।[৩৭]

পার্থিব জীবনে খাজা হাফিয ছিলেন আড়ম্বরহীন ও সাদা সিধে। তিনি নিজের পরিচয় দিতে ভালবাসতেন *'রেন্দ'* বা মাস্তান হিসেবে। মৃত্যুর পরও তার কবর দেখে সে অনাড়ম্বর জীবনের স্মৃতি ভেসে ওঠেছে। তাঁর মাজার জিয়ারতকারীদের উদ্দেশ্যে গেয়েছিলেন–

برسرتربت ما چون گذری همت خواه
বার চারে তুরবাতে মা' চোন গুজারী হিম্মাত খা'হ্
که زیارتگاه رندان جهان خواهد بود
কে জিয়া'রাতগা'হে্ রেন্দা'নে জাহা'ন খা'হাদ বূদ[৩৮]
আমার মাজারে আসতে হলে সাহস চাই বুকে তোমাদের,
হবে জিয়ারতের আসর এটি জগতের যত মস্তানদের।[৩৯]

বাঙালীর সাহিত্য ও কাব্যে রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা সমস্ত দিক, সমস্ত আকাশ, সমস্ত সাহিত্যিক চেতনা পরিব্যাপ্ত করেছিল। এই জাতীয় প্রচণ্ড প্রতিভা যখন বর্তমান থাকে, তখন সেই মহা মহীরুহের আওতায় অন্য সব পাদপ ঢাকা পড়ে যায়। আলোর সেই আকাশ জোড়া অস্তিত্ব জ্ঞাতসারে হোক, অজ্ঞাতসারে হোক অন্য সমস্ত সাহিত্যিক মনকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে রাখে। আকাশ যেমন সর্বত্র খর সর্বব্যাপী, কোথাও তার আওতার বাইরে যেতে পারে না, কোন প্রাণী, এক অন্ধকার গুহায় আত্মগোপন করে থাকা ছাড়া, মুক্ত প্রান্তর যেখানে যাও, যেখানে দাঁড়াও, মাথার ওপরে চাইলেই চোখে পড়বে আকাশের শাসন, চোখ বুঝে বসে থাকলেও শুধু চোখকেই প্রতারণা করা হবে, মন জানে মাথার উপরে রয়েছে এই সর্বগ্রাসী আকাশ তেমনি রবীন্দ্র প্রতিভার অকাশের তলায় যাদের বিচরণ করতে হয়েছে, এক মুহূর্তের জন্যও সে আর বিভূ অস্তিত্বের প্রভাবের বাইরে তারা যেতে পারেননি। কাব্যের অনুভূতির, চেতনার, ছন্দের, সূরের প্রকাশের যে পথ দিয়ে যাও সে পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন মেঘেতে মাথা ঠেকিয়ে রবীন্দ্রনাথ।[৪০]

পারস্যের সাহিত্যে ও কাব্যে মহাকবি হাফিযও বিশ্ববিজয়িনী প্রতিভা। তিনি একটি মাত্র কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। এতেই তিনি বিশ্বনন্দিত। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে–

> দিওয়ানে হাফেজের ছন্দের মহিমা, সুরের মুর্ছনা আর শব্দ ও বাক্যের অনুপম বিন্যাস বিশ্বনন্দিত। কুরআর হেফজের মহিমায় কবি হাফেজের লেখায় সুর, ছন্দ, ও ঝংকারের

সকল আধুনিক উপাদান বিদ্যমান। হাফেজ শুধু কুরআন মজীদ মুখস্থই করেননি, কুরআনের কেরাত বিজ্ঞান ও সুর রীতীতেও অভিজ্ঞ ছিলেন। সকল সাক্ষ্য প্রমাণ একথাই বলে যে, হাফেজ ভাবার্থ ও তারতিলের অপূর্ব মাধুরী মিশিয়ে কুরআন পড়তেন। তাই অনুপম সুন্দর ও মাধুরীমাখা ছন্দরীতির ব্যবহারে তাঁর পুরো দিওয়ান সমৃদ্ধ।...হাফেজের শিল্পকীর্তির মহিমা এখানেই যে, সুর, ছন্দ, ভঙ্গি ও ঝংকারের তালে তালে তিনি ভাব, রস, ভাষা, অর্থ ও আবেদনের প্রাধান্যকে খাটো না করে সাবলীলই করেছেন। এ কারণেই তাঁর কাব্যের ঝর্ণাধারা হতে প্রাণের আকুতি উচ্চারিত। যা আমাদের আত্মাকে জ্ঞান, শিক্ষা ও প্রেমের আলোতে উদ্ভাসিত করে। হাফেজের গজলে বিষয় নির্বাচনের সূক্ষ্মদর্শীতা ও বৈচিত্র্য আমাদের সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা ও সৌন্দর্যের পিপাসাকে নিবৃত্ত করে। সাময়িক সৌন্দর্য পিয়াসা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু হাফেজের চিন্তা, দর্শন ও বিশ্বজনীন আবেদনের সূক্ষ্মতা ও সৌন্দর্য শিল্পমাধুর্যে ভাস্বর ও চিরন্তন।[৪১]

মহাকবি হাফিয হলেন প্রেমিক কবি। তিনি প্রেমের মাধ্যমেই এ বিশ্বকে জয় করতে চান। এজন্যই তাঁর গযল আমাদের আত্মাকে প্রেমের আলোতে উদ্ভাসিত করে। "প্রেমের ধর্ম হচ্ছে–প্রেমিক-প্রেমাস্পদ পরস্পর পরস্পরকে আত্মস্থ করতে আকুল হবে। পরস্পরের মধ্যে আত্মবিলোপে কৃতার্থ হবে। এ প্রেম জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার প্রেম।"[৪২] "ইঞ্জিলের 'যোহন' নামক পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ের ৮ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে He that loveth not knoweth not God for God is love অর্থাৎ যে প্রেম করে না সে ঈশ্বরকে জানেনা কারণ ঈশ্বরই হচ্ছেন প্রেম।"[৪৩] হাফিয বলেন–

در ازل پرتو حسنت ز تجلی و دم زد
দার আযালে পুর তো হাসানাত যে তাযাল্লী দামযাদ
عشق پیدا شدو آتش به همه عالم زد
ইশ্‌ক্বে পায়দা' শোদো অ'তাশ বে হামে অ'লাম যাদ
پیش از این کین سقف سبز وطاق مینا بر کشند
পীশ আয ইন কীন সাক্কফে সাবযো তা'ক্ব মীনা' বার কাশান্দ
منظر چشم مرا آبروی جانان طاق بود
মানযার চাশ্‌মে মারা' অ'বরোয়ী জা'না'ন তা'ক্ব বূদ[৪৪]
অনাদিকালে তোমার সৌন্দর্যের ছায়া যখন তাজাল্লীর চমক ঘটালো
প্রেম সৃষ্টি হলো আর গোটা বিশ্বে প্রেমের আগুন ছড়ালো।
এ সবুজ পৃথিবী ও রঙিন আসমান রূপ লাভের আগেই
প্রিয়তমার ভ্রুকুটি আমার চোখের দৃষ্টি কেড়ে নিল।

অর্থাৎ, যখন তোমার সত্তা প্রকাশ লাভ করতে চাইলো তখন প্রেম সৃষ্টি হলো। আর যা প্রকাশ পেল সেটা ছিল প্রেম। 'গোটা বিশ্বে আগুন ছড়ালো'– এর অর্থ হলো সকল সৃষ্টিকে তোমার প্রেমিকে পরিণত করলো।"[৪৫] মহাকবি হাফিয স্রষ্টাকে বিশ্ব থেকে আলাদা করে দেখেন না। তাইতো তিনি মনে করেন যেখানেই প্রেম, সেখানেই প্রেয়সী রয়েছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাকবি হাফিযের সাথে সুর মিলিয়ে বলেন–

"যুগযুগান্তর হতে তুমি শুধু বিশ্বের প্রেয়সী
হে অপূর্বশোভনা উর্বশী।"[৪৬]

পারস্যে ইসলাম প্রবিষ্ট হওয়ার পরে পারস্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের জন্ম হয়েছে বা উদ্ভব ঘটেছে। রূদাকী, ফেরদৌসী, খৈয়্যাম, সা'দী, জামী, নিজামী, হাফিয পারস্যের ইসলাম উত্তর কবি এবং এরাই ফারসি সাহিত্যকে বিশ্বমানে উত্তীর্ণ করেছেন এবং বিশ্বসুধী দৃষ্টিকে পারস্যের প্রতি আকৃষ্ট করেছেন। কিন্তু এঁদের কেউ পারস্য সাহিত্যকে সংকীর্ণতার বেড়া দিয়ে কূপমন্ডক করে তোলেননি। এঁদের সাহিত্য পড়লে মনে হয় মানুষকে এঁরা উদারতা, প্রসারতা ও মানবপ্রেমিকতায় উত্তীর্ণ করার চেষ্টা করেছেন। জগৎ ও জীবনের রহস্য উদঘাটনের চেষ্টা করেছেন এবং মহামিলনের গানে মনের চিত্তকে উদ্ভোধিত করে একবিশ্ব শান্তি উপস্থাপনায় আন্তরিক প্রচেষ্টায় রত হয়েছেন। মনে হয় মানুষের সমস্ত স্থুল চিন্তাকে উৎখাত করে মানুষের স্বরূপের উৎসের সন্ধানে তারা ব্যাপৃত হয়েছেন। বিশ্বের মহাত্তোম কবিরা স্রষ্টার মানুষ সৃষ্টির কারণ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন ফারসি কবিরা যেন তাঁরই আধুনিক ভাষ্যকার। আর তাঁরা তাঁদের সেই চিন্তাকে সকল ধর্মশাস্ত্রের বা রাষ্ট্রীয় শাসনের ভ্রূকুটির কুটিল অনুশাসনকে তুচ্ছ ও অগ্রাহ্য করে সেই বিশাল সাহিত্যকে সৃষ্টি করেছেন। মনে হয় যদি ফারসি সাহিত্যের সৃষ্টি না হতো তাহলে বোধ হয় দান্তে, গ্যেটে, শেক্সপীয়ার বা মিল্টনের জন্ম হতো না। ফারসি সাহিত্যের সুবাতাস গায়ে মেখেই যেন বিশ্ব সাহিত্য সাম্য-মৈত্রী, স্বাধীনতা, শান্তি বা মানবতার দীক্ষা লাভ করেছেন।[৪৭]

রবীন্দ্র বা তৎসম যুগে হিন্দু শিক্ষার্থীদের ভাষার মাধ্যম ছিল প্রধানত সংস্কৃত। তবে বৈষয়িক উন্নতির জন্য এবং জ্ঞানের বিশালতার জন্য সংস্কৃতের সঙ্গে ফারসি ভাষা শিক্ষার ওপরও গুরুত্ব দেয়া হতো। মুঘল আমলে সরকারি ভাষা ফারসি হওয়ায় এর মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায়। এজন্য সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে ফারসি শিক্ষা লাভ করার গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। একজন বিদ্যার্থী যত ভাষাই জানুন আর যত জ্ঞানই অর্জন করুন না কেন ফারসি ভাষা আয়ত্ত করতে না পারলে তাকে সামাজিক এবং পারিবারিক উভয় দিক থেকেই তিরস্কৃত হতে হতো। ফারসি ভাষা ও সাহিত্যের সূফী কবি হিসেবে পারস্যের

মহাকবি শেখ ফরিদ উদ্দীন আত্তার, সা'দী, হাফিয, খৈয়্যাম, রুমি ও জামী জনপ্রিয় কবি। এঁদের আধ্যাত্মিক কাব্যগ্রন্থসমূহ বিশেষত *পান্দ ন'মেহ্ আত্তার*, *মানতেকুত তায়ের*, *করম-ই-সা'দী*, *গুলিস্তান*, *বুস্তান*, *শাহ্নমেহ্ ফেরদৌসী*, *রুবাইয়্যাতে ওমর খৈয়্যাম*, *দীওয়ানে হাফিয* ও *মাসনাভীয়ে মা-নাভী* সূফী দর্শনের আকর গ্রন্থ হিসেবে সমধিক পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে পারস্যের সূফিবাদের প্রভাব মহাকবি হাফিযের আবির্ভাবের পরেই সূচিত হয়। এ সময়ে বাংলা সাহিত্যের অনেক কবি সাহিত্যিক মহাকবি হাফিযের কবিতা বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুসলিম সাহিত্যিকরা হলেন– ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, কাজী আকরাম হোসেন, আজিজুল হাকিম, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, কবি আবদুল হাফিজ, আবদুস সত্তার, অধ্যাপক মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, কাজী নজরুল ইসলাম। আর উলেখ্নযোগ্য অমুসলিম সাহিত্যিকেরা হলেন– অজয় কুমার ভট্টাচার্য, গিরিশ চন্দ্র, নরেন্দ্রদেব, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিত লাল মজুমদার। তবে কবিগুরু বরীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপরোক্ত কবি-সাহিত্যিকদের মত মহাকবি হাফিযের কবিতার অনুবাদ না করলেও তাঁর চিন্তাধারায় যে মহাকবি হাফিযের প্রভূত প্রভাব রয়েছে তা উপর্যুক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে।

তথ্যনির্দেশ

১. ড. আহমাদ তামীমদারী, *ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাস*, অনুবাদ: তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী ও মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, আল হুদা আন্তর্জাতিক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০৭, পৃ. ১৮৯।

২. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পরিচিতি: কবিগুরুর পৈত্রিক নিবাস খুলনা জেলার রূপসা থানাধীন পিঠাভোগ নামক স্থানে। ঠাকুর পরিবারের আদি পুরুষ ভট্টনারায়ণ বঙ্গরাজ আদিশূরের আমন্ত্রণে কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ ছিলেন ভট্টনারায়ণ ছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তৎপুত্র দীন কুশারী বর্ধমানের কুশ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁদের পারিবারিক উপাধি হয়ে যায় কুশারী। এই বংশের জগন্নাথ কুশারী খুলনার পিঠাভোগ গ্রামে এসে বসবাস করতেন। জগন্নাথ কুশারীর ১২ তম অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। জগন্নাথ কুশারীর পর বংশাণুক্রমে পুরুষোত্তম কুশারী, বলরাম কুশারী, হরিহর কুশারী, রাসমণি কুশারী, মহেশ্বর কুশারী, পঞ্চানন কুশারী, নীলমণি কুশারী, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ বংশের পঞ্চানন কুশারী খুলনা ত্যাগ করে গঙ্গার কূলে কালী ঘাটের কাছে গিয়ে বাড়ী করেন। পশ্চিম বাংলার কৈবর্ত জেলে মালো প্রভৃতি জাতির লোকেরা নবাগতদের 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করতো বলেই এ বংশের উপাধি কুশারী থেকে ঠাকুরে পরিণত হয়। পঞ্চানন কুশারী পিঠাভোগ গ্রাম ছেড়ে কলকাতা গেলেও কুশারী বংশের অন্যান্যরা পিঠাভোগেই বসবাস করতে থাকেন। সর্বশেষ এ বাড়ীতে বসবাস করেন গৌরচন্দ্র কুশারী ও অন্যান্যরা। ১৯৯৫ সালের ২৪ শে নভেম্বর এখানে রবীন্দ্রস্মৃতি সংগ্রহশালা নির্মাণ কাজের উদ্বোধন করা হয়।

সংস্থাপন করা হয় রবীন্দ্র ভাস্কর্য। সংগ্রহশালার কাজও এগিয়ে চলছে। এ সংগ্রহশালার পকিল্পনা-সূচির মধ্যে রয়েছে এ ভিটার জমি ক্রয়, সংগ্রহশালা ও পাঠাগার নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, সংশ্লিষ্ট ভৈরব নদীর ঘাট নির্মাণ প্রভৃতি। এ সংগ্রহশালা পূর্ণাঙ্গ রূপ পেলে তা হবে রবীন্দ্র-স্মৃতি সংরক্ষণে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। খুলনা জেলার ফুলতলা থানার নিকবর্তী উত্তরে এবং ঢাকা মহাসড়কের পূর্বপার্শ্বে দক্ষিণ ডিহি নামক স্থানে ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রবীন্দ্র কমপ্লেক্স। খুলনার এই ডিহিই হচ্ছে বিশ্ব বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা- দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তারই জমিদারীর ক্যাশিয়ার ব্রজরায় চৌধুরীর বড় বোন সারদা সুন্দরীকে বিবাহ করেন। সারদা সুন্দরীর ছোট বোন ত্রিপুরা সুন্দরীকে বিবাহ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাকা। জমিদারীর সেরেস্তাদার (কর্মচারী) বেণী মাধবের কন্যা ফুলিকে বিবাহ করেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। ফুলীর বয়স তখন ১১ বছর এবং রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ২২ বছর। বিবাহের তারিখ ছিল ৯ই ডিসেম্বর ১৮৮৩ সাল (বাংলা ২৪শে অগ্রহায়ণ, ১২৯০ বঙ্গাব্দ) ফুলতলার মেয়ে বলেই তাকে ফুলী বলে ডাকা হতো। রবীন্দ্রনাথের এই স্ত্রীই তিন নামে পরিচিত ক. ফুলী, খ. ভবতারিনী, গ. মৃণালিনী। মৃণালিনী দেবী মাত্র ৩০ বছর বয়সে ১৯০২ সালে মারা যায়। মৃণালিনী দেবী ছিলেন ৫ সন্তানের জননী। ১. মাধুরী (১৮৮৬), ২. রথীন্দ্রনাথ (১৮৮৮), ৩. রেণুকা (১৮৯০), ৪. মীরা (১৮৯২), ৫. সমীন্দ্রনাথ (১৮৯২)। পিতা, কাকা এবং নিজের শ্বশুরালয় এ খুলনায়। প্রসিদ্ধ তিন ঠাকুরের আত্মীয়তার বন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয় দক্ষিণাঞ্চলের দক্ষিণ ডিহিতে। ১৯৯৫ সালে খুলনা জেলা প্রশাসক কাজী রিয়াজুল হক ও তার সহযোগীরা দক্ষিণ ডিহির ঠাকুর পরিবারের পূর্বপুরুষের অরক্ষিত এবং বেদখলকৃত বাড়ীটি দখলে এনে রবীন্দ্র কমপ্লেক্স প্রতিষ্ঠা করায় কবির পূর্ব পরিচিতির ইতিবৃত্ত জানার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে ডিহি শব্দটি -ফারসি দেহ্ শব্দের উৎপত্তি। জমিদারের প্রধান গ্রাম দক্ষিণ ডিহি বলতে দক্ষিণে অবস্থিত এই শ্রেণীর স্থানকে বোঝানো হয়েছে।

সূত্র: ডাঃ বিকর্ণ রায়: রবীন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহশালা, *দক্ষিণ ডিহি কমপ্লেক্স স্মারক গ্রন্থ*, ২৬শে নভেম্বর ১৯৯৫, প্রকাশক-দক্ষিণ ডিহি স্মারক কমপ্লেক্স, ফুলতলা আইডিয়াল কেমিক্যাল এন্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস লি:, ১৭ বাবু খান রোড, খুলনা, পৃষ্ঠা-১১৯ ও ড, শেখ গাউস মিয়া, *মহানগরী খুলনা ইতিহাসের আলোকে*, মো: আলী আসগর লবী এমপি, চেয়ারম্যান আলী হাফেজ ফাউন্ডেশন, ৩৩ ইউসুফ মঞ্জিল, ইউসুফ রোঁ মির্যাপুর রোড, খুলনা, ২০০২, পৃষ্ঠা-৪২০-২১; প্রফেসর বজলুল করিম, *ইতিহাস ও ঐতিহ্যে খুলনার দৌলতপুর*, মিতালী বই ঘর দৌলতপুর, খুলনা, ২০০৩, পৃ. ৩৮৯-৯০; অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *পশ্চিম বংলার গ্রাম নাম*, প্রথম সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ১৯৮০, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পালিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পৃ. ৯৯।

৩. ড. মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *বাংলাদেশে ফার্সী সাহিত্য*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৩), পৃ. ৫৭।

৪. নিউজ লেটার, ৩৫তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই, আগস্ট ২০১৩ ইং কালচারাল কাউন্সিলরের দফতর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা, পৃ. ৩৮।

৫. কাজী আবদুল *ওদুদ রচনাবলী*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১০।

৬. মুহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, জাকিয়া মনসুর, হাসি প্রকাশনা, ঢাকা ২০০২ পৃ. ৩৩৭।

৭. *রবীন্দ্র- রচনাবলী*, একাদশ খণ্ড, ঐতিহ্য, রুমী মার্কেট, ঢাকা-২০০৬, পৃ. ৭২৯।

৮. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮২।

৯. **গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ্ :** বাংলার স্বাধীন সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ্ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রি.)। ১৩৯৩ খ্রিস্টাব্দে গিয়াস উদ্দীন রাজ্য দখলের সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে বাংলার মসনদ দখল করে 'আজম শাহ্' উপাধী গ্রহণ করেন। তাঁর রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসে অত্যন্ত গৌরবোজ্জ্বল সময়। বিখ্যাত ফারসি গবেষক এস.এম. ইকরাম -এর মতে খুব সম্ভবত এটিই ছিল বাংলায় ফারসি সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। সুলতান গিয়াস উদ্দীন যেমন ছিলেন ফারসি কবি-সাহিত্যিকগণের পৃষ্ঠপোষক অপরদিকে তিনি নিজেও ফারসি কাব্যচর্চা করতেন। তাঁর রাজদরবারে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে খ্যাতিমান কবি-সাহিত্যিকগণের আগমন ঘটতো। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, বিদ্বান ও কবিদের পৃষ্ঠপোষণ, সূফী-সাধকদের প্রতি ভক্তি, ইসলামি সভ্যতার কেন্দ্রস্থলে মাদ্রাসা স্থাপন এবং চীন সম্রাটের সঙ্গে দূত বিনিময়ের জন্য তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ফারসি ও আরবি ভাষায় কবিতা লিখতেন এবং ইরানের বিখ্যাত কবি হাফিজকে বাংলায় আগমনের আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন।

সূত্র: আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস : সুলতানী আমল।* (জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৭), পৃ. ২০৭।

১০. খাজা শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ হাফিয শিরাজী, *দীওয়ানে হাফিয*, সাযেমা'নে ছাপখানেও এনতাশারা'তে ওজারাতে ফারহাং ওয়া এরশাদে ইসলামী, ইরান. ১৩৭৫ ফারসী সালে প্রকাশিত, পৃ. ২০৮।

১১. **তিন প্রেয়সী :** এরা হলেন–সারভো, গুল ও লা'লে এরা ছিলেন সুলতান গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ্-এর খাদেম। এদের একত্রে বলা হত ثلاثه غساله (সালা'সেহ গাসসা'লেহ)। সুলতানের অসুস্থতার সময় এদের বিশেষ সেবা প্রদানের মাধ্যমে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

১২. আজকে... মিষ্টি মাখা। এ চরণ দুটি কবি কাজী নজরুল ইসলাম অনুদিত, আবদুল কাদির সম্পাদিত, *নজরুল রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ৪৫

১৩. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, *ইরানের বুলবুল হাফেজ শিরাজী*, (ঢাকা: ইসলামী গবেষণা ও প্রশিক্ষণ একাডেমী, মে ১৯৯০), পৃ. ৭১।

১৪. *রবীন্দ্র- রচনাবলী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮৩।

১৫. *ঐ*, পৃ. ৭২৯।

১৬. *ঐ*, পৃ. ৭৩০।

১৭. *ঐ*, পৃ. ৭২৯।

১৮. *ঐ*, পৃ. ৭০১।

১৯. *ঐ*, পৃ. ৭৩২-৩৩।

২০. সৈয়দ মুজতবা আলী, *রুবাইয়াৎ-ই- ওমর খৈয়াম*, *কাজী নজরুল ইসলাম*, ভূমিকা, কলিকাতা ১৯৯৮।

২১. সরকার সাহাবুদ্দীন আহমেদ, *ইতিহাসের নিরিখে রবীন্দ্র নজরুল চরিত*, বাংলাদেশ কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ ঢাকা-১৯৯৮ পৃ. ১২৩।

২২. জগদীশ ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রক কবিতা শতক*, ভারিবি, ১৩/১, কলকাতা-৭৩. ২০০১, পৃ. ২১৭।

২৩. শাহেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪২।

২৪. আবদুল ওহাব, বাঙালা সাহিত্যে সুফিবাদ ও বাউল সাধনার প্রভাব, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ঢাকা: জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃ. ৮৪।

২৫. আবদুস্ সাত্তার, *ফারসী সাহিত্যের কালক্রম*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ১৯৮৭), পৃ. ৬২।

২৬. শিরাজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৬।

২৭. ড. আহমাদ তামীমদারী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৮।

২৮. শাহেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬

২৯. শিরাজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯১।

৩০. কাজী নজরুল ইসলাম, সৈয়দ মুজতবা আলী, *রুবাইয়াৎ-ই- ওমর খৈয়াম*, প্রাগুক্ত।

৩১. **রাজা রামমোহন রায়:** ১৭৭২ সালে উপমহাদেশের এক বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে হুগলি জেলার এক গ্রামে অভিজাত ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই রামমোহনের উপর বাবা ও মা উভয় বংশধারার প্রভাব লক্ষ করা যায়। বাবা রামকান্ত রায় চেয়েছিলেন রামমোহন লেখাপড়া শিখে রাজ দরবারে চাকুরি করবেন ও সাথে সাথে বিষয়-সম্পত্তি তথা জমিদারি দেখাশুনা করবেন। তাই তিনি রামমোহনকে ফার্সি ভাষা শেখানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ সে আমলে ফার্সি ছিল রাজভাষা। রামমোহনের ফার্সি শেখার হাতে খড়ি কোথায় হয়েছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। গবেষকেরা মনে করেন শৈশবে নিজ গ্রামে তিনি কিছুটা ফার্সি শেখেন। নয় বছর বয়সে তাঁকে পাটনা প্রেরণ করা হয় ফার্সি ভাষা তথা রাজভাষা আয়ত্ত করার জন্য। পাটনায় ফার্সি ও আরবি আয়ত্ত করার পরও তা ঝালাই করতে থাকেন কোলকাতার সদর দেওয়ানি আদালতে কর্মরত মাওলানাদের সহায়তায়। তৎকালে সদর দেওয়ানি আদালতগুলোতে ইসলামি আইন বোঝার জন্য মাওলানা নিযুক্ত থাকতেন। এসব মাওলানা ফার্সি ও আরবি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ফার্সি ভাষায় দক্ষতা বাড়ানোর তাগিদে রামমোহন মাওলানাদের সাথে নিবিড় যোগাযোগ গড়ে তোলেন। সাথে সাথে তিনি আরবি ভাষা চর্চা করে তাতেও

বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করেন। এর ফলে তিনি ফার্সি ও আরবি ভাষায় মুসলিম দর্শন এবং ইউরোপীয় প্রাচীন দর্শন ও বিজ্ঞান চর্চা করে নিজেকে সমৃদ্ধ করেন। এভাবে রামমোহন একাধারে ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেন। রাজা রামমোহনের সমাজদর্শনের প্রথম প্রকাশ ঘটে ১৮০৩ সালে ত্রিশ বছর বয়সে মুর্শিদাবাদে থাকাকালে ফার্সি ভাষায় লেখা তুহফাৎ-উল-মুয়াহ-হিদীন নামক পুস্তিকার মাধ্যমে। রামমোহনের চিন্তা-চেতনায় ইতোমধ্যে যুক্তিবাদী দর্শনের যে বীজ রোপিত হয়েছিল তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে এ পুস্তিকায়। বস্তুত তুহফাৎ-উল- মুয়াহ-হিদীন বা একেশ্বর-বিশ্বাসীদের উপহার নামক পুস্তিকায় তিনি সকল গোঁড়ামি ও কুসংস্কারপূর্ণ উগ্র বিশ্বাসবাদী ধর্মের পরিবর্তে বিশুদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। এ পুস্তিকায় তিনি যে দর্শন তুলে ধরেন পরবর্তীতে সারাজীবনই তা তিনি লালন করেছেন। কোন কিছুতেই তা থেকে তিনি দূরে সরে যাননি। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন– "রামমোহনের যৌবনকালে যে ক্ষুদ্র পুস্তিকা রচিত হয় তার মধ্যে যে কথা তিনি বলেছিলেন, সেটাই ছিল তাঁর জীবনভর সাধনার মূল উৎস। কুরআন অধ্যয়ন, আরবি ভাষার মাধ্যমে গ্রিক দার্শনিকদের মত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে তাঁর মন কঠোর যুক্তিবাদী হয়ে উঠেছিল।" *তুহফাৎ-উল-মুয়াহ-হিদীন* পুস্তিকায় রামমোহনের বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিবাদী চেতনাবোধের সাথে অপার মানবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৮০৩ সালে রামমোহন যখন তুহফাৎ-উল- মুয়াহ-হিদীন রচনা করেন তখন পাশ্চাত্য আধুনিক দর্শনের সাথে পরিচিত ছিলেন না। এ পর্যায়ে মূলত তিনি ইসলামি দর্শন ও প্রাচীন ইউরোপীয় ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা করেন। ফলে তাঁর এ পুস্তিকায় ইসলামের একেশ্বরবাদ প্রাধান্য লাভ করে। এছাড়াও তিনি হাফিজ, সাদি, সিরাজ প্রমুখ দার্শনিক কবির কবিতার মুক্তচিন্তা ও মানবতাবাদী ভাবধারা দিয়ে সিক্ত হন। হাফিজের বয়াত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এর প্রকাশ ঘটে।

সূত্র: প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, *রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ. ৭০-৯১ ও আব্দুল মালেক, রামমোহন রায়ের শিক্ষা-সমাজ দর্শন : একটি মূল্যায়ন, *দর্শন ও প্রগতি* : গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৬শ বর্ষ : ১ম ও ২য় সংখ্যা : জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৯, পৃ. ১০৩-১১২।

৩২. Obaidullah El Obaide, *Tuhfat-ul-Muwahhidin* (K.P. Bagchi& Co. Calcutta 1975), p. 21.

৩৩. শিরাজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪।

৩৪. আব্দুল মালেক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১১-১১২।

৩৫. "শাখ্-ই-নবাত" বূলবুল-ই-শিরাজ কবি হাফিজের মানসী প্রিয়া ছিলেন। "শাখ্-ই-নবাত"-এর- অর্থ "আখের শাখা"। "শাখ্-ই-নবাত"-এর পরিচিতি: শিরাজ থেকে চার মাইল দূরে বাবাকুহী পর্বতে পীরই সবুজ নামে একটি স্থান আছে। প্রবাদ প্রচলিত ছিল- ইরানে যদি কোন যুবক এই সবুজ উপত্যকায় চল্লিশটি নিদ্রাহীন রজনী যাপন করতে পারে, তবে সে একজন মহাকবি হতে পারবে। আর হাফেজ সম্পর্কে সারা ইরানে এখনো কিংবদন্তি আছে যে, হাফেজ তার যৌবনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি সবুজ উপত্যকায় চলিশটি

রজনী যাপন করবেন। সেই উপত্যকার পাশে এক সুন্দরী মহিলার গৃহ ছিল। তারই নাম 'শাখ্-ই-নবাত'। প্রতিদিন সবুজ উপত্যকায় যাবার সময় তিনি এ রমনীর গৃহের সামনে দিয়েই যেতেন। দুপুর বেলা বিশ্রাম করতেন এবং রাত্রিতে তন্মতায় জেগে থাকতেন। এভাবে উনচল্লিশ দিন পার হয়ে যায়। চাল্লিশ দিনের সকালে যখন হাফেজ শাখ্-ই-নবাতের গৃহের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন প্রেয়সী হাফেজকে ইশারায় দৈহিক সম্ভোগের আমন্ত্রণ জানায় এবং তার গৃহে রাত্রি যাপন করতে অনুরোধ করে। এ যুবতীর উদ্যমপূর্ণ প্রেম নিবেদনকে হাফেজ উপেক্ষা করেছিলেন। আপন প্রতিজ্ঞা পালনে অটল হাফেজ রমণীর আবদার প্রত্যাখ্যান করে সবুজ উপত্যকায় চলে যান। পরদিন সকাল বেলায় দেখা গেল সবুজ পোষাক পরিহিত একজন বৃদ্ধ সবুজ উপত্যকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তিনি হাফেজকে অনন্ত জীবনের স্বাদগ্রহণ করার জন্য একটি পানীয় পান করতে দিলেন। আর হাফেজ অমরতা লাভ করলেন অনন্তকালের জন্য।

সূত্র; গাজী রফিক, *দৈনিক বাংলা*, ঢাকা-২১ অক্টোবর ১৯৮৮ ও *শাহেদী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৫।

৩৬. *শ্রেষ্ঠ নজরুল*, আদুল মান্নান সৈয়দ, সম্পাদিত ও সংকলিত, ঢাকা ১৯৯৬, পৃ. ১৭১-৭৩;

৩৭. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৮৪।

৩৮. শিরাজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫৫

৩৯. শাহেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯।

৪০. শাহাবুদ্দীন আহমেদ, নজরুল সাহিত্যে ফারসির প্রভাব, *আঞ্জুমানে ফারসি বাংলাদেশ*, সেমিনার ১০ মার্চ, ১৯৯৯, পৃ. ০১।

৪১. শাহেদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

৪২. আনোয়ারুল করিম, 'লালনগীতিকায় সূফীবাদের প্রভাব', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ৪৯ বর্ষ: ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, জুলাই ২০০৫- ডিসেম্বর ২০০৫, (ঢাকা: বাংলা একাডেমী ১০০০), পৃ. ২৮৭।

৪৩. আলহাজ্ব সৈয়দ আহমাদুল হক, *মসনবী শরীফের পয়গাম ও তাফসীর বাণী ও ভাষ্য* (চট্টগ্রাম: আল্লামা রুমী সোসাইটি ২০০৪), পৃ. ৭৫।

৪৪. শিরাজী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭ ও ১৫৬।

৪৫. শহীদ আয়াতুল্লাহ মূর্তাজা মোতাহ্হারী, *হাফিযের আধ্যাত্মিক দর্শন ও হাফিজ সম্পর্কে রাহবার সাইয়্যেদ আলী খামেনেয়ী'র ঐতিহাসিক ভাষণ*, অনুবাদ : মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস বাদশা ও ড. মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী, সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফরিদউদ্দিন খান, কালচারাল কাউন্সিলরের দফতর, ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাস, ঢাকা ২০১২ খ্রি. পৃ. ১২০-১২১।

৪৬. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ২য় খণ্ড (চিত্রা), *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৪।

৪৭. শাহাবুদ্দীন আহমেদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৭।